সংবাদ
Primary Edu.

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বনাম অবাধ্য ক্ষুধা

তারিখ ... ১৭.৫.৮৫
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ ...
17 MAY 1985

অনিরুদ্ধ

প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করার আবেদন জানিয়ে সম্প্রতি একজন পাঠক চিঠি দিয়েছেন। চিঠির উদ্দিষ্ট হলেন সরকার। পত্রিকার মারফত আবেদনে একটা সর্বজনীনতা আছে। চিঠিটা প্রেসে গেছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিরক্ষরতা দূর করার জন্য অর্থাৎ গণশিক্ষার জন্য সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে ২৯০ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা করেছেন। সে টাকাটা প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে চিঠিতে। যুক্তি পরিষ্কার; আজকের শিশুর শিক্ষা ব্যবস্থা না করে বয়স্ক লোককে সাক্ষর করার মধ্য দিয়ে পরিসংখ্যানগত সাক্ষর লোকের অগ্রগতি কিছুটা দেখানো হলেও পরবর্তী প্রজন্ম তো নিরক্ষরতার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠবে। এতে নিরক্ষর লোকের সংখ্যাই বাড়বে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার সময় কিঞ্চিদধিক সাড়ে চার কোটি লোক আজকের বাংলাদেশে বাস করতো। তখন শিক্ষিতের হার ছিল ২০ শতাংশ অর্থাৎ ৯০ লাখের মত। আজ জনসংখ্যা ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৯ কোটি ৬২ লাখ। ১৯৮৫ সালে এসে বেশি না হলেও দশ কোটিতে পৌঁছেছে। এখন শিক্ষিতের হার শতকরা ২২ শতাংশ। বিশ্ব ব্যাংকের সমীক্ষায় আরও কিছুটা বেশি। তাহলে দেখা যাচ্ছে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের পূর্ব পাকিস্তানের (আজকের বাংলাদেশ) দ্বিগুণ।

১৯৭৪ সালে যখন লোক সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ১৫ লাখ, ১৯৮০ সালে তা আট কোটি ছাড়িয়ে যায়। ওই সময়ের জরিপে দেখা যায় শিশুকিশোরের (৫-১৪ বছর) মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা ১ কোটি ১১ লাখ (এখন ২ কোটি)। প্রাথমিক স্তরে পড়তো (৫-৯ বছর) ৮৪ লাখ আর মাধ্যমিক স্তরে (৯-১৪) ৩৩ লাখ ৩০ হাজারের মত। এখন ১ কোটির উপর প্রাথমিক স্তরে পড়ে। দেড় কোটির উপর নিরক্ষর। ওই সময়ে আরও একটি তথ্য দেয়া হয়েছে যে, তাতে দেখা যায়, প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তরে উত্তীর্ণ হয় শতকরা ৪০ ভাগেরও কম শিশু। প্রথম বর্ষে যেখানে ১০০ ছাত্র থাকে ৩য় বর্ষে, তা দাঁড়ায় শতকরা ৩১'৪ ৫ম বর্ষে ৩০, ৮ম বর্ষে ১২'৩ এবং ১০ম বর্ষে মাত্র ৮'৪ জন।

এর কারণ আর্থিক অসচ্ছলতা, বাপ-মা ক্রমাণ্বয়ে শিশুকে স্কুল জীবন থেকে ছাড়িয়ে নিতে বাধ্য হন এবং তারা ওই সময় থেকেই সংসারে বাড়তি উপার্জনের জন্য যেকোন ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকে। গ্রামের দিকে জমিতে, শহরে ছোটখাট দোকানদারী, দোকান কর্মচারী, হকার ইত্যাদি কাজ খুঁজে নেয় বা নিতে চেষ্টা করে। আর যারা আদৌ বিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙ্গানোর সুযোগ পায় না এ ধরনের শিশু-কিশোর শহরে বাড়ীতে, চায়ের দোকানে কাজ করে। রাস্তার পাশে জুতো পালিশ করে, ছোটখাট মেশিন চালায়, কলে-কারখানায় খাটে, অফিসের মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের জন্য টিফিন ক্যারিয়ারে লাঞ্চ নিয়ে যায়। গ্রামের জমিতে খাটে, এবং পুরুষানুক্রমে পৈতৃক পেশায় নিয়োজিত থাকে বহু শিশু-কিশোর।

গরীব বাপ-মা শুধু অর্থাভাবে শিশুকে স্কুলে পাঠান না এমন নয়, অবৈতনিক শিক্ষা ছাড়াও বিনামূল্যে বই-খাতা দিলেও অনেক পরিবারে বাড়তি আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের স্কুলে পাঠাতে গরীব বাপ-মা উৎসাহবোধ করেন না। এমন কি পড়াশুনা করবে এমন স্বপ্ন কদাচিত কেউ দেখে।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস একটু পিছনে ফিরে দেখা যাক। ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত তৎকালীন বাঙ্গালা সরকার (কোম্পানীর আমল) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে কোনরূপ উৎসাহ দেখায়নি। প্রাথমিক স্কুলগুলোকে বলা হত পাঠশালা। তালপাতা ও কলাপাতায় লেখার পর কাগজে লেখা হত। শ্রেণী বিভাগও স্পষ্ট ছিল না। কোম্পানীর শাসনের অবসানে (১৮৫৮ সাল) প্রত্যক্ষ বৃটিশ রাজের আমলে ১৮৬২ সালে এদিকে নজর দেয়া হয়। উন্নত ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর ক্ষেত্রে গ্রামের শিক্ষক (গুরু) দের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি 'আদর্শ' স্কুল স্থাপন করা হল। সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেয়ার এই প্রচেষ্টা কার্যক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল দেয়নি। বরং দেখা গেল ছাত্রসংখ্যা কমছে এবং গরীব পরিবার অর্থাৎ তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর সন্তানরা স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

এর পরের পরিকল্পনাকে বলা হয় ভূদেব মুখার্জির উন্নত পাঠশালা স্কীম। এক্ষেত্রে দেশী পাঠশালার সাথে সাদৃশ্য রাখার ব্যবস্থা থাকে। তবে এই উন্নত পাঠশালার জন্য গণ-শিক্ষা নয় অর্থাৎ সকল স্তরের বিশেষ করে আর্থিক ক্ষেত্রে নিম্নস্তরের ছেলে-মেয়ের সংখ্যা স্কুলে বাড়াবার জন্য নয় একথা ভূদেব মুখার্জি পরিষ্কার বলেছেন। নিম্ন শ্রেণীর যারা পড়তে এসেছে, তারা পড়াশুনা ত্যাগ না করে এটা দেখা হবে, কিন্তু তাদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা প্রচার তার লক্ষ্য নয়।

তারপর বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে এসে দেখি ঢাকা নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মেলনে ১৬ নং প্রস্তাবে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা অচিরে প্রবর্তনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৩৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন এ, কে ফজলুল হক সাহেব এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ডাঃ আর আহমেদ। কলকাতা তখন সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা নিয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিতর্কে উত্তপ্ত। জিন্নাহ সাহেবের দ্বিজাতি তত্ত্ব ঘোষণাকে যেন সত্য হিসেবে গ্রহণ করে "বাংলার সেই সমগ্র হিন্দু জাতির পক্ষ থেকে" সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সভাপতির আসন গ্রহণের জন্য টাউনহলের প্রতিবাদ সভায় আমন্ত্রণ জানালেন। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে উন্মত্ত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। সে বিষয় এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।

তারপর প্রতিষ্ঠিত হল পাকিস্তান, ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মধ্যে এই বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা স্থান পেয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ১৯৮০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক করা এবং তা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব দেয়া হয় (ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট। ৭ম অধ্যায়)।

তারপর এ ব্যাপারে যা হয়েছে তাহল এই কমিশনকে পাশ কাটিয়ে নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তনের উদ্যোগ। জিয়ার আমলে বয়স্ক শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা অভিযান এমন জোরেশোরে চালু হল, তাতে মনে হল এবার অশিক্ষার অভিশাপ চলে যাবে। বিদেশী কাগজ এল, টাকা এল। বই লেখক টাকা পেলেন, মুদ্রাকর টাকা পেলেন, বিক্রেতা সবাই কমবেশি পেলেন। বিনামূল্যের বই কিছু বিলি হল, কিছু বিক্রি হল ঠোঙ্গা হিসেবে, কিছু গুদামজাত রইল। প্রকাশিত এসব রিপোর্টের বাদ-প্রতিবাদে পাঠকদের সরগরম করে তুলল। কিন্তু যাদের শিক্ষা পাবার তাদের কিছুই হল না। একেবারে হয়নি একথা বলবো কেমন করে। একটা কুমীরের বাচচাকে ৭ বার দেখানোর মত নিরক্ষরতার হার কমে সাক্ষরতার হার বাড়তে লাগল। এস এস সি পরীক্ষার্থী ২ জন নিরক্ষরকে শিখাবেন। এর জন্য নির্দিষ্ট নম্বর প্রাপ্ত নম্বরে যোগ হবে। কলেজে প্রক্সি চলে। এবার সাক্ষরতার প্রক্সি দেয়া শুরু হল।

এতদিন পর আবার বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার কথাটা একজন পাঠক তুলেছেন। 'বাধ্যতামূলক'-এর বাধাটা এখানে যে, শিক্ষা লাভেচ্ছু শিশুটির খাওয়া-পড়ার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক হওয়া চাই। রিপোর্টে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার কথাটা উল্লেখের পিছনে সমাজ পরিবর্তনের কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রক্ষার জন্যই করা হয়েছে।

তারপর এলো নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিশাপ থেকে মুক্ত করার কার্যক্রম। তার ফলাফল কী দাঁড়িয়েছে ১৯৮১ সালের আদমশুমারি সাক্ষ্য। বয়স্ক শিক্ষা ও নৈশ বিদ্যালয় এখন কোথাও কোথাও নামফলকে বিদ্যমান। এনজিওসমূহ এক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ করেছে। কার্যত: তা ছেঁড়া প্যান্টে তাপ্পি লাগানোতে পর্যবসিত। শিক্ষার কোন উদ্দেশ্য নেই। পাঠ্যপুস্তকে ক্রমাগত নামফলক পরিবর্তন হচ্ছে। সচিবালয়ের সেক্রেটারী বদল হলে যেমন পিতলের নামফলকটা বদলায় আমাদের সমাজ-বিজ্ঞানে, ইতিহাসে চলছে সেই ধারা। ছেলেমেয়েদের শিক্ষালাভের পিছনে ঐতিহাসিক চেতনার কোন স্থান না থাকে, শিক্ষা শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠার সোপান হবে আর তার চূড়ায় পৌছানোর প্রতিযোগীর সংখ্যা যাতে সীমিত থাকে তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ঢাকার কিণ্ডারগার্টেন ও চাইনিজ রেস্তোরাঁই একমাত্র সম্প্রসারণশীল ব্যবসা। চূড়া সংকীর্ণ, তাতে বড়জোর কিছু নির্বাচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ভাগ্যবানের স্থান হতে পারে। উপরে ওঠার প্রতিযোগিতায় তাই মুষ্টিমেয় নির্বাচনের ব্যবস্থাটা রয়েছে। শিক্ষিত এলিট আর অর্ধশিক্ষিত ও নিরক্ষর অভাজন সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েই এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ার সাধনা চলছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই বিকৃত জ্ঞানের খণ্ড খণ্ড সমাবেশ। যেখানে প্রতিনিয়ত অভিযোগ আসে দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ এক এক সংস্করণে এক একটা লেখা হয়। কোন কোন নাম থাকে অনুচচারিত কিংবা বিকৃত ভাবে উপস্থাপন। উচচ শ্রেণীর পাঠ্য একটি ইতিহাস পুস্তকে লেখা হয়েছে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভাষণ শেষে "জয়বাংলা, জয় পাকিস্তান বলেন।" তারপরই ব্যাখ্যা জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, জয়বাংলা বলে তিনি বাঙ্গালীর জয় কামনা করেছেন এবং জয় পাকিস্তান বলে তিনি পাকিস্তানের মঙ্গল চেয়েছেন। নীচ থেকে উপর পর্যন্ত এ জাতীয় বহু ধরনের উদাহরণ দেয়া চলে। পাঠ্য পুস্তক প্রণেতারা যথেষ্ট জ্ঞানী নহেন, এরকম কথা তাদের অতিবড় শত্রুও বলবেন না।

অবৈতনিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য সঠিক পাঠ্য পুস্তকই একমাত্র দরকার একথা বলছি না। আরও একটু এগিয়ে যেতে হবে তার অর্থ যোগানোর জন্য মধ্যবিত্তকে (যাদের দু'বেলা তৃপ্তিকর আহার জোটে অন্তত: আমাদের দেশের জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী) তাদেরও কিছু স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ এবং তারপরও কিছুটা কষ্ট স্বীকার করতে হবে। অর্থাৎ সমগ্র জাতিকে এই প্রচেষ্টায় অংশীদার হতে হবে। ইতিহাস সত্যকে অস্বীকার করে 'সংগ্রামী' ভূমিকার নেতৃত্বের দুর্দৈব দেখে এই শিক্ষা গ্রহণে নিশ্চেষ্ট তার জন্য জাতির বিভিন্নিপিবোধ হয় এমনই হয়।

যাক সে কথা, আমাদের সাথে ত্যাগের শরিক হতে পারা যায়, শুধু অবস্থার চাপে কৃচ্ছ্রতা সাধন করতে হয়, তা ত্যাগ নয়। আর ত্যাগ ছাড়া, জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ না হয়ে, শিক্ষা খাতে বিদেশী কাগজ বা বিনামূল্যে বই-পুস্তক সরবরাহের জন্য সাহায্য নির্ভর অবৈতনিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা সম্ভব নয়। যারা কোমল হাতে বই শ্লেট জড়িয়ে ধরে ক্লাসে আসবে, সেই হাত আজ রাস্তায় টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে ছুটছে অফিসে, চায়ের দোকানে সেই হাত কাপ নিয়ে দিচ্ছে টেবিলে টেবিলে, রাস্তার পাশে জুতো পালিশ করছে। ঘরে ঘরে সে হাত বিবি সাহেবের জন্য উদয়াস্ত নানা কাজে ব্যস্ত, সে হাত ওয়ার্কশপে, মাঠে ঘামে ভিজছে, তা থেকে তাকে মুক্ত করার মন্ত্রটা কে উচচারণ করতে রাজি আছেন? সদিচ্ছা জানাতে ও প্রচার করতে খুব বড় একটা ঝামেলা নেই। কিন্তু তা কীভাবে হবে সেই রূঢ় বাস্তবকে মুখোমুখি হতে আমরা কতটা রাজি, কতদূর যেতে রাজি সে প্রশ্ন নিজেকেই করতে হবে। এর জন্য সভা ডাকার প্রয়োজন পড়ে না। চিঠি লিখে কাউকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না। তবু সচেতন মন বারংবার এ নিয়ে কথা বলতে চায়, দেশবাসীকে সজাগ করতে চায়। পত্রলেখক সেই সদিচ্ছাই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কোন সমস্যা শুধু সদিচ্ছা দিয়ে সমাধান সম্ভব নয়। যে জাতি আজ সমাজ দেহে, ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার সন্ধানে, সেখানে পথের দিশাটা নির্মোহ ভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন আজকের মুহূর্তে বেশী।

আজকের অবস্থাটা স্বীকার করে নিয়ে এগোতে হবে। শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি, শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি ক্রমাণ্বয়ে শিক্ষাকে আভিজাত্যের কোঠায় ঠেলে দিচ্ছে। এই মানসিকতা শিক্ষাকে কোন্ স্তরে বাধ্যতামূলক করার কথা চিন্তা করতে পারে না। লোক দেখানো ঠাঁট যাই হোক শিক্ষার দুয়োরানী চেহারা অভাজনদের জন্য, আর তার সুয়োরানী রূপ যাদের জন্য, তাকে পাওয়ার মতো রূপোও তাদের পর্যাপ্ত আছে। এ অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে শিক্ষাকে সমাজের নীচু স্তর পর্যন্ত পরিশ্রুত করার ফিল্টার এ যে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরবে, তা সকলের তৃষ্ণার্ত কণ্ঠের জন্য একান্তই অকিঞ্চিৎকর। এ কথাটা কেমন করে অস্বীকার করা যাবে?

ক্ষুধা যাদের অবাধ্য হতে প্ররোচিত করে শিক্ষার দিকে যেতে, সেই ক্ষুধাকে নিবৃত্তি ছাড়া তাদের কাছে বাধ্যতামূলক শিক্ষা কীভাবে পৌঁছে দেয়া যাবে সে কথার জবাবটাও তাদের জানিয়ে দিতে হবে।

00-049